পঞ্চম অধ্যায়

বুঝে পড়ি লিখতে শিখি

১ম পরিচ্ছেদ

প্রায়োগিক লেখা

আগের শ্রেণিতে আমরা রোজনামচার কথা জেনেছি। অনেকে নিয়মিত রোজনামচা লেখেন, কেউ কেউ বিরতি দিয়ে হলেও রোজনামচা লেখেন। তুমি যদি খাতায় বা ডায়েরিতে রোজনামচা লিখে রাখো, তবে তা পরে তোমার কাজে লাগতে পারে। এমনকি সেসব লেখা পড়ে তখন তোমার নিজেরও ভালো লাগতে পারে।

চিঠিও এক ধরনের প্রায়োগিক লেখা। একসময়ে দূরবর্তী যোগাযোগের প্রধান উপায় ছিল এই চিঠি। পরিবারের লোকজনের কাছে কিংবা পরিচিত মানুষের কাছে চিঠি লিখে খবর জানানো হতো, আবার চিঠি লিখে খবর জানতে চাওয়া হতো। জবাবে তিনিও চিঠি লিখতেন। চিঠি সাধারণত খামে ভরে পাঠানো হয়। খামের উপরে বাম পাশে প্রেরকের নাম-ঠিকানা ও ডান পাশে প্রাপকের নাম-ঠিকানা লেখা হয়। চিঠির ব্যবহার ক্রমে কমে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে আজকাল বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল মাধ্যমে এ জাতীয় যোগাযোগের কাজ বেশি হচ্ছে।

নিচের চিঠিটি একজন মুক্তিযোদ্ধার। একাত্তরের রণাঙ্গন থেকে তিনি তাঁর মায়ের কাছে চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠির লেখক: ফেরদৌস কামাল উদ্দীন মাহমুদ। আর চিঠির প্রাপক: হাসিনা মাহমুদ।

চিঠি

০৩/০৮/৭১

মা,

আমার সালাম নিয়ো। অনেক পর্বত, নদী প্রান্তর পেরিয়ে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তোমার ছেলে তার অনেক আকাঙ্ক্ষার শেষ ঠিকানা আজ খুঁজে পেয়েছে। হ্যাঁ মা, আমি পৌঁছে গেছি আমার ইচ্ছার কেন্দ্রবিন্দুতে। নিজেকে এবার প্রস্তুত করব প্রতিশোধ নেওয়ার এক বিশাল শক্তি হিসেবে। আমার প্রতিশ্রুতি আমি কখনো ভুলব না। ওদের উপযুক্ত জবাব আমাদের দিতেই হবে।

মা, তুমি এই মুহূর্তে আমাকে দেখলে চিনতে পারবে না। বিশাল বাবরি চুল, মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। যদিও আমি নিজের চেহারাটা বহুদিন দেখি না কারণ এখানে কোনো আয়না নেই। মিহির বলে, আমাকে নাকি আফ্রিকার জংলিদের মতো লাগে। মিহির ঠিকই বলে, কারণ, এখন আমি নিজেই বুঝি আমার মাঝে একটি জংলি ভাব এসে গেছে। সেই আগের আমি আর নেই। তোমার মনে আছে মা, মুরগি জবাই করা দেখতে পারতাম না। আর সেই আমি আজ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটি।

খাওয়া-দাওয়ার কথা বলে লাভ নেই, দুঃখ পাবে। তবে বেঁচে আছি ও খুব ভালো আছি। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা আর সেই দিনটি থেকে খুব দূরে নাই, যখন আমরা আবার মুখোমুখি হব। দোয়া করো মা, যেন সেই দিনটি পর্যন্ত বেঁচে থাকি। মনি ভাই আমাদের Officer করেনি কারণ ওনার অন্য কাজের জন্য আমাদের প্রয়োজন পড়বে। এখানে আমার অনেক পুরানো বন্ধুর দেখা পেলাম। আমার আগের চিঠিটা হয়তো এত দিনে পেয়ে গেছ। সেলিম তোমার সাথে দেখা করে এসেছে, বলল। তোমরা ভালো আছ জেনে খুশি হলাম। আমার জন্য কোনো চিন্তা কোরো না। মায়ের দোয়া আমার সাথে আছে, আমার ভয় কী? অনেক লেখার ইচ্ছা করছে কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। কত ঘটনা মনে জমা হয়ে আছে তোমাদের বলার জন্য! হয়তো অনেক বছর লেগে যাবে শেষ করতে। মন্টু চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। পারলে ওকে একটু ভালো কিছু খাবারদাবার দিয়ো। অনেক দিন ও ভালো কিছু খায়নি। আজ তাহলে ৮০, সবাইকে সালাম ও দোয়া দিও।

তোমার স্নেহের ফেরদৌস।

শব্দের অর্থ

আকাঙ্ক্ষা: প্রত্যাশা।

৮০: 'আসি' বোঝাতে সংখ্যায় ৮০ লেখা হয়েছে।

প্রান্তর: বিস্তৃত মাঠ।

প্রাপক: যিনি পাবেন।

প্রেরক: যিনি পাঠান।

বাবরি চুল: কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ানো চুল।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. এই চিঠির প্রেরক ও প্রাপক কে? .....

.....

.....

খ. চিঠিটি বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে লেখা? .....

.....

.....

গ. প্রেরক কেন চিঠিটি লিখেছেন? .....

.....

.....

.....

.....

ঘ. একটি চিঠির কোন অংশে কী লিখতে হয়? .....

.....

.....

.....

.....

ঙ. চিঠি কেন লেখা হয়? .....

.....

.....

.....

বলি ও লিখি

উপরের চিঠিতে প্রেরক প্রাপককে যা যা জানাতে চেয়েছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

নিজের অভিজ্ঞতা

চিঠি পড়া, লেখা বা এ সংক্রান্ত তোমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে তা লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চিঠির বিবেচ্য

চিঠি লেখার সময় নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়:

১. শুরুতে তারিখ এবং জায়গার নাম লিখতে হয়।

২. সম্বোধন দিয়ে চিঠি শুরু করতে হয়।

৩. চিঠির প্রথম দিকে বয়স অনুযায়ী সালাম, শুভেচ্ছা বা শুভাশিস জানাতে হয়।

৪. চিঠির বক্তব্য গুছিয়ে সহজ ভাষায় লিখতে হয়।

৫. শেষ অংশে বিদায় জানাতে হয় এবং নিজের নাম লিখতে হয়।

৬. চিঠি খামে ভরে প্রেরক ও প্রাপকের ঠিকানা লিখে ডাকে পাঠাতে হয়।

চিঠি লিখি

এবার তুমি একটি চিঠি লেখো। চিঠি কাকে লিখবে এবং কোন বিষয়ে লিখবে, আগে ভেবে নাও। লেখার সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো খেয়াল রেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২য় পরিচ্ছেদ

বিবরণমূলক লেখা

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ সালে আসামের করিমগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। আফগানিস্তানের কাবুলে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এছাড়া মিশরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচনার একটি বড়ো অংশ ভ্রমণকাহিনি। সরস ভাষায় ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন 'দেশে-বিদেশে', 'জলে ডাঙায়'। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচা কাহিনী', 'ময়ূরকণ্ঠী' ইত্যাদি। নিচের লেখাটি সৈয়দ মুজতবা আলীর 'জলে ডাঙায়' গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

পিরামিড

সৈয়দ মুজতবা আলী

পিরামিড! পিরামিড!! পিরামিড!!!

অনেক সময়ে আশ্চর্য প্রকাশ করতে হলে আমরা তিনটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন–!!!–দিই। তাই কি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটা পিরামিড? কিংবা উলটোটা? তিনটা পিরামিড ছিল বলে আমরা তিনবার আশ্চর্য হই? এই পিরামিডগুলো সম্বন্ধে বিশ্বজুড়ে যা গাদা গাদা বই লেখা হয়ে গিয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলেই একখানা আস্ত 'জলে-ডাঙায়' লিখতে হয়। কারণ এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ–যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা করেছে, দেয়ালে-খোদাই লিপি উদ্ধার করে এদের সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে। জানো তো, পিরামিডের ঠিক মাঝখানে একটা কুঠুরিতে বিস্তর ধনদৌলত জড়ো করা আছে-তারই পথ অনুসন্ধান করছে পাকা সাড়ে ছ হাজার বছর ধরে। ইরানি, গ্রিক, রোমান, আরব,

তুর্কি, ফরাসি, ইংরেজ পর পর সবাই এদেশ জয় করার পর প্রথমেই চেষ্টা করেছে পিরামিডের হাজার হাজার মন পাথর ভেঙে মাঝখানের কুঠুরিতে ঢুকে তার ধনদৌলত লুট করার। এবং আশ্চর্য, যিনি শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পারলেন, তিনি ধন লুটের মতলবে ঢোকেননি। তিনি ঢুকেছিলেন নিছক ঐতিহাসিক জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য।

ফারাওয়ের রাজমিস্ত্রিরা কুঠুরি বানানো শেষ করার পরে বেরোবার সময়ে এমনই মস্ত পাথর দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বাইরের দেয়ালে পালিশ পলেস্তারা লাগিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর মানুষের সাড়ে ছ হাজার বছর লাগল ভিতরে যাবার রাস্তা বের করতে!

মিশরের ভিতরে বাইরে আরও পিরামিড আছে কিন্তু গিজে অঞ্চলে যে তিনটা পিরামিডের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে সেগুলোই ভুবন-বিখ্যাত, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম।

রাজা	নির্মাণের সময়	ভূমিতে দৈর্ঘ্য	উচ্চতা
খুফু	৪৭০০ খ্রিষ্টপূর্ব	৭৫৫ ফুট	৪৮১ ফুট
খাফরা	৪৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব	৭০৬ ফুট	৪৭১ ফুট
সেনকাওরা	৪৫৫০ খ্রিষ্টপূর্ব	৩৪৬ ফুট	২১০ ফুট

প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু বললে, না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় না। এমনকি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না, এরা ঠিক কতখানি উঁচু। চ্যাপ্টা আকারের একটা বিরাট জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে পাঁচশো ফুট উঁচু না হয়ে যদি চোঙার মতো একই সাইজ রেখে উঁচু হতো তবে স্পষ্ট বোঝা যেত পাঁচশো ফুটের উচ্চতা কতখানি উঁচু।

বোঝা যায় দূরে চলে গেলে। গিজে এবং কায়রো ছেড়ে বহু দূরে চলে যাওয়ার পরও হঠাৎ চোখে পড়ে তিনটা পিরামিড সব কিছু ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আর পিরামিড ছেড়ে যদি সোজা মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাও, তবে মনে হবে সাহারার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার পরও বুঝি পিরামিড দেখা যাবে!
তাই বোঝা যায়, এ বস্তু তৈরি করতে কেন তেইশ লক্ষ টুকরা পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল। 'টুকরা' বলতে একটু কমিয়ে বলা হলো কারণ এর চার-পাঁচ টুকরা একত্র করলে একখানা ছোটোখাটো ইঞ্জিনের সাইজ এবং ওজন হয়। কিংবা বলতে পারো ছ ফুট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া করে এই পাথর নিয়ে একটা দেয়াল বানালে সে দেয়াল লম্বায় ছশো পঞ্চাশ মাইল হবে। অর্থাৎ সে দেয়াল কলকাতা থেকে দার্জিলিং গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে!

সব চেয়ে বড়ো পিরামিডটা বানাতে নাকি এক লক্ষ লোকের বিশ বৎসর লেগেছিল।

ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, সে সম্রাটের কতখানি ঐশ্বর্য আর প্রতাপ ছিল, যিনি আপন রাজধানীর পাশে লক্ষ লক্ষ লোককে বিশ বৎসর খাওয়াতে-পরাতে পেরেছিলেন। অন্য খরচের কথা বাদ দাও, এই এক লক্ষ লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, সেটা গড়ে তোলা এবং তাকে বিশ বছর ধরে চালু রাখা তারাই করতে পারে, যারা সভ্যতার খুব একটা উঁচু স্তরে উঠে গিয়েছে।
এইবার আমরা পিরামিড নির্মাণের কারণের কাছে পৌঁছে গিয়েছি।

প্রথম কারণ সকলেরই জানা। ফারাওরা (সম্রাটরা) বিশ্বাস করতেন, তাঁদের শরীর যদি মৃত্যুর পর পচে যায়, কিংবা কোনো প্রকারের আঘাতে ক্ষয় হয় তবে তাঁরা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবেন না। তাই মৃত্যুর পর তাঁদের দেহকে 'মমি' বানিয়ে সেটাকে এমন একটা শক্ত পিরামিডের ভিতর রাখা হতো যে, তার ভিতরে ঢুকে কেউ যেন 'মমি'কে ছুঁতে পর্যন্ত না পারে। কিন্তু হায়, তাঁদের এ বাসনা পূর্ণ হয়নি। পূর্বেই বলেছি, হাজার হাজার বছর চেষ্টা করে দুষ্ট (অর্থাৎ ডাকাত) এবং শিষ্টেরা (অর্থাৎ পন্ডিতেরা) শেষ পর্যন্ত তাঁদের গোপন কবরে ঢুকতে পেরেছেন। তাই করে অবশ্য গৌণত কোনো কোনো ফারাওয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে–পন্ডিতেরা তাঁদের মমি সযত্নে জাদুঘরে সাজিয়ে রেখেছেন। সেখানে তাঁরা অক্ষত দেহে মহাপ্রলয়ের দিন গুনছেন, যেদিন তাঁরা নব দেহে নব যৌবন ফিরে পেয়ে অমৃতলোকে অনন্ত জীবন আরম্ভ করবেন।

শব্দের অর্থ

অনুসন্ধান করা: খোঁজ করা।

অমৃতলোক: স্বর্গ।

ঐশ্বর্য: সম্পদ।

কায়রো: মিশরের রাজধানী।

কীর্তিস্তম্ভ: কোনো কাজ বা ঘটনার স্মরণে তৈরি করা স্থাপনা।

কুঠুরি: ছোটো ঘর।

ক্ষীণ: সরু।

গিজে: কায়রোর একটি জায়গার নাম।

গৌণত: অপ্রধানভাবে।

চোঙা: ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে আসা গোল পাত্র।

জল্পনা-কল্পনা: নানা রকম চিন্তা ও অনুমান।

দেয়ালে-খোদাই লিপি: দেয়ালে খোদাই করা কোনো লেখা।

পরলোক: মৃত্যুর পরবর্তী জগৎ।

পাকা খবর: প্রকৃত তথ্য।

পালিশ পলেস্তারা: মসৃণ প্রলেপ।

পিরামিড: বিশেষ আকৃতির প্রাচীন স্থাপনা।

প্রতাপ: ক্ষমতা।

ফারাও: মিশরের প্রাচীন রাজাদের উপাধি।

ফিরিস্তি: বিবরণ।

বিস্তর: অনেক।

মতলব: ফন্দি।

মনোবাঞ্ছা: মনের ইচ্ছা।

মমি: বিশেষ উপায়ে সংরক্ষিত মৃতদেহ।

মহাপ্রলয়ের দিন: পৃথিবী ধ্বংসের দিন।

রাজমিস্ত্রি: যাঁরা ইট, পাথর ইত্যাদি দিয়ে দালান তৈরির কাজ করেন।

সপ্তাশ্চর্য: পৃথিবীর সাতটি অবাক-করা নিদর্শন।

সাহারা: মরুভূমির নাম।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. লেখক এখানে কীসের বিবরণ দিয়েছেন? .....

.....

.....

.....

খ. পিরামিডগুলো কারা তৈরি করেছিলেন এবং কখন তৈরি করেছিলেন? .....

.....

.....

.....

গ. পিরামিডগুলো কেন তৈরি করা হয়েছিল? .....

.....

.....

ঘ. পিরামিডগুলো কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল? .....

.....

.....

.....

ঙ. পিরামিড একটি পুরাকীর্তি। বাংলাদেশের যে কোনো পুরাকীর্তির সাথে এর মিল-অমিল খুঁজে বের করো। .....

.....

.....

.....

.....

.....

বলি ও লিখি

‘পিরামিড’ রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা তোমার নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

লেখা নিয়ে মতামত

‘পিরামিড’ রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। বোঝার সুবিধার জন্যে দুটি নমুনা দেওয়া হলো।

‘পিরামিড’ রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১. এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ	এ তথ্যটি সঠিক কি না যাচাই করতে হবে।
২. ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, সে সম্রাটের কতখানি ঐশ্বর্য আর প্রতাপ ছিল, যিনি আপন রাজধানীর পাশে লক্ষ লক্ষ লোককে বিশ বৎসর খাওয়াতে-পরাতে পেরেছিলেন।	শুনেছি আগেকার রাজা-বাদশারা জোর করে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন ধরে এনে দাস হিসেবে কাজ করাতো, যা অত্যন্ত অমানবিক ছিল। পিরামিড বানানোর সময়ে এ ধরনের কিছু ঘটেছিল কি না জানতে হবে।
৩.	
৪.	

বিবরণ লেখার কৌশল

কোনো স্থান, বস্তু, বিষয় বা ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয় যে ধরনের রচনায়, তাকে বিবরণমূলক লেখা বলে। ধরা যাক, পুকুরের ধারে লম্বা একটা তালগাছ তুমি দেখেছ। তুমি তার বিবরণ লিখতে পারো। বিবরণ লিখতে পারো জন্মদিনের সন্ধ্যার, কিংবা নিজের জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনার। নিজের চোখে দেখা বিষয় নিয়ে যেমন এ ধরনের লেখা তৈরি করা যায়, তেমনি অন্যের লেখা পড়ে বা অন্যের মুখে শুনেও বিবরণমূলক রচনা লেখা যায়।

বিবরণ লেখার জন্য বিষয়টি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা দরকার। এজন্য লেখা শুরু করার আগে বিষয়টি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে হতে পারে, বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করা যেতে পারে, অথবা অভিজ্ঞ লোকের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এরপর ঠিক করতে হবে কীভাবে পুরো রচনাটি তুমি উপস্থাপন করতে চাও। ধরা যাক, তোমার দেখা তালগাছ নিয়ে তুমি একটি বিবরণমূলক লেখা তৈরি করতে চাও। তাহলে শুরুতে লিখতে পারো এ গাছটি তুমি কোথায় দেখেছ কিংবা এর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে কীভাবে। এরপর বলতে পারো তালগাছ দেখতে কেমন, কিংবা অন্য গাছের সঙ্গে এর মিল-অমিল কী। তালগাছের উপকারী দিকের খোঁজ-খবর নিয়ে তাও লিখতে পারো।

লেখার ভাষা সহজ-সরল রাখাই ভালো। বিবরণমূলক লেখায় আবেগ প্রকাশের ব্যাপারটি মুখ্য নয়, তবু তোমার ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি যুক্ত হতে পারে। মূল বিবরণের পাশাপাশি লেখার শুরু ও শেষটা যাতে আকর্ষণীয় হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। এ ধরনের লেখায় অনুচ্ছেদের সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে। বিষয় অনুযায়ী রচনাটির একটি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম দিতে হয়।

বিবরণ লিখি

মানুষের তৈরি পুরানো কোনো স্থাপত্য নিদর্শনকে পুরাকীর্তি বলে। বাংলাদেশে অনেক পুরাকীর্তি আছে, যেগুলোর কোনো কোনোটি হাজার বছরের বেশি পুরানো। যেমন: বগুড়ার মহাস্থান গড়, নওগাঁর সোমপুর বিহার, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির, ঢাকার আহসান মঞ্জিল ইত্যাদি। তোমার এলাকার অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরানো কোনো স্থাপত্য সম্পর্কে ১০০ থেকে ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি বিবরণ লেখো।

.....

.....

.....

৩য় পরিচ্ছেদ

তথ্যমূলক লেখা

নিচে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে একটি লেখা দেওয়া হলো। এটি গোলাম মুরশিদের লেখা। গোলাম মুরশিদ ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে 'আশার ছলনে ভুলি', 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জগদীশচন্দ্র বসু

গোলাম মুরশিদ

নানা দেশে পৌঁছে গেছে বাঙালিরা। এমনকি, পৌঁছে গেছে চাঁদেও! নভোযানে করে যায়নি। তবে বাংলার নামটা চাঁদে পৌঁছে গেছে। চাঁদের গায়ে কালো কালো অনেক দাগ দেখা যায়। এগুলি আসলে বড়ো বড়ো গর্ত। এর মধ্যে একটা গর্তের নাম দেওয়া হয়েছে একজন বাঙালির নাম অনুসারে। তিনি একজন বিজ্ঞানী। এই বিজ্ঞানীর নাম জগদীশচন্দ্র বসু।

১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তিনি জন্মেছিলেন মুন্সিগঞ্জ জেলার রাঢ়িখাল গ্রামে। অঞ্চলটি তখন বিক্রমপুর নামে পরিচিত ছিল। এই বিজ্ঞানীর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে। কয়েক বছর পর তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে অন্য জায়গায় চলে যান। তিনি মনে করতেন, লেখাপড়া শুরু করা উচিত মাতৃভাষা বাংলা দিয়ে। তারপরে ইংরেজি পড়া।

জগদীশ বাংলা ভাষায় তাঁর লেখাপড়া আরম্ভ করেছিলেন। একটু বড়ো হয়ে তিনি কলকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। তারপর ভর্তি হন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেখান থেকে তিনি ১৮৭৯ সালে বিএ পাশ করেন। এই কলেজে থাকাকালে তিনি ইউজিন লাফোঁ নামে একজন শিক্ষকের কাছাকাছি আসেন। এই শিক্ষক জগদীশের মনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। এই আগ্রহ পরবর্তী কালে তাঁকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে।

সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পাশ করার পর ১৮৮০ সালে ডাক্তারি পড়ার জন্য জগদীশ ইংল্যান্ডে যান। সেখানে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু লাশ-কাটা শিখতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন ইংল্যান্ডে ছিলেন আনন্দমোহন বসু। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি র‍্যাংলার। র‍্যাংলার হচ্ছে গণিতের সবচেয়ে উঁচু ডিগ্রি। তাঁর সাহায্যে জগদীশ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কাজ করেন লর্ড র‍্যালে এবং অন্য কয়েকজন নাম-করা শিক্ষকের অধীনে। র‍্যালে পরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। জগদীশ সাধারণ ডিগ্রি না করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস ডিগ্রি করেন ১৮৮৪ সালে। ঐ একই বছর তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রিও লাভ করেন। কয়েক বছর পর তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রিও পান।

বিজ্ঞান কথাটার অর্থ আমরা জানি। যিনি বিজ্ঞান বিষয়ে লেখাপড়া করেছেন, তিনি হলেন বিজ্ঞানী। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি করেছেন, তাঁকেও তাই বিজ্ঞানী বলা যায়। কিন্তু সত্যিকার বিজ্ঞানী বলে তাঁকে, যিনি কোনো না কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাজ করেছেন; যেমন টেলিফোন আবিষ্কার।

জগদীশ ছিলেন পদার্থ-বিজ্ঞানী। তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেকগুলি জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন। মানুষ এসব জিনিসের কথা আগে জানত না। যেমন, বৈদ্যুতিক চুম্বক-তরঙ্গের কথা। এই তরঙ্গ এতটা লম্বা যে, তাকে কাজে লাগনো যায় না। জগদীশ খুব ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আবিষ্কার করেন। একে বলে মাইক্রোওয়েভ। তিনি মাত্র ৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। এখন যে রেডিও-টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মাইক্রোওয়েভ কুকার ইত্যাদি দেখতে পাই, সেগুলো জগদীশ বসুর আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে।

১৮৯৪ সালে তিনি কলকাতার টাউন হলে তাঁর আবিষ্কারের কয়েকটা জিনিস প্রকাশ্যে দেখান। তিনি এক ঘরে বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে বিনা তারে অন্য ঘরে রাখা বারুদে আগুন লাগিয়ে দেন। বিনা তারে অন্য একটা ঘরে বেল অর্থাৎ ঘণ্টা বাজান।

তাঁর গবেষণার আর-একটা ক্ষেত্র হলো গাছপালা, উদ্ভিদ। এরা কথা বলতে পারে না, এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যেতে পারে না। কিন্তু এদের প্রাণ আছে, মানুষ তা অনুমান করত। তবে এরা যে মানুষের কাজে সাড়া দেয়, তা জানত না। ধরা যাক, মানুষ একটা লতার একটুখানি কেটে দিলো। লতাটা অমনি প্রবলভাবে কেঁপে উঠল। কিন্তু এই কম্পন চোখে দেখা যায় না। সেটা মাপার জন্য জগদীশ একটা যন্ত্র তৈরি করেন। তার নাম ক্রেস্‌কোগ্রাফ। আর একটা উদাহরণ দিই। জানালার কাছে একটা চারা গাছ লাগালে, গাছটা যেদিক দিয়ে আলো আসছে সেদিকে বেঁকে যাবে। জগদীশ এটাও পরীক্ষা করে দেখান।

এখন ঘরে ঘরে টেলিভিশন দেখা যায়। টেলিভিশনে কথা শোনা যায়, ছবিও দেখা যায়। রেডিওতে কেবল কথা শোনা যায়। রেডিওর মাধ্যমে বিনা তারে যোগাযোগের মূল কৌশলটি জগদীশ আবিষ্কার করেন ১৮৯৬ সালে। কাছাকাছি সময়ে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী মার্কনি-ও একই কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। তবে কথা-বলা রেডিও আবিষ্কার হতে আরও কয়েক বছর লেগেছিল।

অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্র বসুকে সম্মানসূচক ডিএসসি উপাধি দেয়। তিনি এফআরএস উপাধি পান। ব্রিটিশ সরকার ৫০ পাউন্ডের নোটে তাঁর ছবি ছাপে।

শব্দের অর্থ

অনুমান করা: আন্দাজ করা।

ইন্টারনেট: তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের সংযোগ-ব্যবস্থা।

এফআরএস: ফেলো অব দ্য রয়াল সোসাইটি; লন্ডনের বিজ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান রয়াল সোসাইটি থেকে পাওয়া সম্মান।

ক্রেস্‌কোগ্রাফ: উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপার যন্ত্র।

ট্রাইপস ডিগ্রি: কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি।

ডিএসসি: ডক্টর অব সায়েন্স; বিজ্ঞান বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট: জেলা প্রশাসনের অধীন কর্মকর্তা।

নভোযান: রকেট।

নোবেল পুরস্কার: বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নামে যে পুরস্কার দেওয়া হয়।

পাউন্ড: যুক্তরাজ্যের মুদ্রা।

প্রকাশ্যে: সবার সামনে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান: উদ্ভিদ, প্রাণী, পদার্থ, পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

মাইক্রোওয়েভ কুকার: মাইক্রোওয়েভ বা ক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহার করে যে যন্ত্রে রান্না করা হয়।

সাড়া: প্রতিক্রিয়া।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে এই লেখায় কী কী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে?.....

.....

.....

.....

খ. এই লেখা থেকে সাল-ভিত্তিক তথ্যগুলো ছকের আকারে উপস্থাপন করো:

সাল	তথ্য
১৮৫৮	জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম

গ. এই ধরনের জীবন-তথ্যমূলক আর কী কী রচনা তুমি পড়েছ? .....

.....

.....

ঘ. এই লেখা থেকে জগদীশচন্দ্র বসুর কী কী আবিষ্কারের কথা জানতে পারলে? .....

.....

.....

.....

.....

ঙ. বিবরণমূলক লেখার সাথে তথ্যমূলক লেখার মিল-অমিল খুঁজে বের করো। .....

.....

.....

.....

.....

বলি ও লিখি

‘জগদীশচন্দ্র বসু’ রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

লেখা নিয়ে মতামত

'জগদীশচন্দ্র বসু' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো।

'জগদীশচন্দ্র বসু' রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১.	
২.	

তথ্যমূলক লেখার কৌশল

তথ্য পরিবেশন করা যেসব লেখার মূল লক্ষ্য, সেগুলোকে তথ্যমূলক লেখা বলে। এ ধরনের লেখায় তথ্য পরিবেশনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। বইপত্র পড়ে, অনলাইনের মাধ্যমে কিংবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য পাওয়া যায়। তথ্য উপস্থাপনের সময়ে জানা তথ্যও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে মিলিয়ে নিতে হয়। তথ্যমূলক রচনাকে আকর্ষণীয় করার জন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা দরকার।

এ ধরনের লেখায় বিষয় অনুযায়ী একটি শিরোনাম থাকে। কোন তথ্যের পরে কোন তথ্য পরিবেশন করা হবে, তার একটি ধারাবাহিকতা রাখতে হয়। সাধারণত একই ধরনের তথ্য এক জায়গায় রাখা হয়। তথ্যমূলক লেখার মধ্যে ছবি, ছক, সারণি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

কোনো ব্যক্তির জীবনী, স্কুল বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি, বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা-নির্ভর বিবরণ ইত্যাদি নিয়ে তথ্যমূলক রচনা তৈরি করা যায়। তথ্যমূলক লেখার মূল উদ্দেশ্য পাঠককে তথ্য জানানো। তাই এ ধরনের লেখায় ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ঠিক নয়। যেমন, তুমি হয়তো বাংলাদেশে মোবাইল ব্যবহারকারীদের নিয়ে একটি তথ্যমূলক রচনা তৈরি করতে চাও। এক্ষেত্রে তোমার মোবাইল আছে কি নেই, মোবাইল ব্যবহার করতে ভালো না মন্দ লাগে, এ রকম কথা লেখার দরকার নেই। বরং বছর অনুযায়ী মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা, কোন ধরনের মোবাইল ব্যবহারকারী কত জন, এগুলো উল্লেখ করা জরুরি।

তথ্যমূলক রচনা লিখি

তোমরা দলে ভাগ হও। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করো। এখানে কয়েকটি নমুনা-প্রশ্ন দেওয়া হলো:

১. স্কুলের আশেপাশে কী কী ফলের গাছ আছে? কোন গাছ কতটি করে আছে?

২. স্কুলের আশেপাশে কী কী ফুলের গাছ আছে? কখন কোন ধরনের ফুল ফোটে?

৩. তোমাদের এলাকায় কোন কোন পাখি বেশি দেখা যায়? কোন পাখির রং কেমন?

৪. তোমার এলাকায় কোন কোন পেশার মানুষ আছে? তারা কী ধরনের কাজ করেন?

৫. স্কুলের আশেপাশে কোন কোন ধরনের দোকান আছে? কোন দোকানে কী কী জিনিস পাওয়া যায়?

একেকটি দল একেকটি বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করবে। এরপর এসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকে পৃথকভাবে একটি তথ্যমূলক রচনা লিখবে।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্লেষণমূলক লেখা

বিবরণমূলক লেখায় কোনো বস্তু, বিষয় বা ঘটনার বিবরণ থাকে। আর তথ্যমূলক লেখায় কোনো বিষয়ের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অন্যদিকে বিবরণ ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশ করা হয় যেসব রচনায়, তাকে বিশ্লেষণমূলক লেখা বলে।

নিচে একটি বিশ্লেষণমূলক লেখা দেওয়া হলো। এটি আনিসুজ্জামানের লেখা। আনিসুজ্জামান ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২০ সালে মারা যান। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে আছে 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', 'স্বরূপের সন্ধানে', 'বিপুলা পৃথিবী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কত কাল ধরে

আনিসুজ্জামান

বাংলাদেশের ইতিহাস প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস। হয়তো আরও বেশি সময়ের। এ ইতিহাসের সবটা আজও ভালো করে জানা নেই আমাদের। আলো-আঁধারের খেলায় অনেক পুরানো কথা ঢাকা পড়েছে।

ইতিহাস বলতে শুধু রাজ-রাজড়াদের কথাই বোঝায় না। বোঝায় সব মানুষের কথা। এককালে এদেশে রাজ-রাজড়া ছিল না, তখন মানুষের দাম ছিল বেশি। লোকজন নিজেরাই যুক্তি পরামর্শ করে কাজ করত, চাষ করত, ঘর বাঁধত, দেশ চালাত।

তারপর তেইশ-চব্বিশশ বছর আগে–রাজা এলেন এদেশে। সেই সঙ্গে মন্ত্রী এলেন, সামন্ত-মহাসামন্তের দল এলেন। কত লোক-লস্কর বহাল করা হলো, কত ব্যবস্থা, কত নিয়মকানুন দেখা দিলো।

এক কথায় তখন কারো গর্দান যেত, কেউ বড়োলোক হয়ে যেত কারও খুশির বদৌলতে। তখন থেকে ইতিহাসে বড়ো বড়ো অক্ষরে রাজাদের নাম লেখা হয়ে গেল, আর প্রজারা রইল পেছনে পড়ে।

তবু এদের কথা কিছু কিছু জানা যায়, পরিচয় পাওয়া যায় এদের জীবনযাত্রার।

হাজার বছর আগে সব পুরুষই পরত ধুতি, সব মেয়েই শাড়ি। শুধু সচ্ছল অবস্থা যাদের, তাদের বাড়ির ছেলেরা ধুতির সাথে চাদর পরত, মেয়েরা শাড়ির সাথে ওড়না ব্যবহার করত। এখনকার মতো তখনো মেয়েরা আঁচল টেনে ঘোমটা দিত, শুধু ওড়নাওয়ালিরা ঘোমটা দিত ওড়না টেনে। তবে ধুতি আর শাড়ি দুই-ই হতো বহরে ছোটো। তাতে নানা রকম নকশাও কাটা হতো। মখমলের কাপড় পরত শুধু মেয়েরা। নানা রকম সূক্ষ্ম পাটের ও সুতোর কাপড়ের চল ছিল। জুতো পরতে পেত না সাধারণ লোকে–শুধু যোদ্ধা বা পাহারাদাররা জুতো ব্যবহার করত। সাধারণে পরত কাঠের খড়ম। ছাতা-লাঠির ব্যবহার ছিল।

সাজসজ্জার দিকে বেশ ঝোঁক ছিল প্রাচীন বাঙালির। চুলের বাহার ছিল দেখবার মতো। বাবরি রাখত ছেলেরা। না হয় মাথার ওপরে চুড়ো করে বাঁধত চুল। এখন মেয়েরা যেমন ফিতে বাঁধে চুলে, তখন শৌখিন পুরুষেরাও অনেকটা তেমনি করে কোঁকড়া চুল কপালের ওপর বেঁধে রাখত। মেয়েরা নিচু করে 'খোঁপা' বাঁধত–নয়তো উঁচু করে বাঁধত 'ঘোড়াচূড়'। কপালে টিপ দিত, পায়ে আলতা, চোখে কাজল আর খোঁপায় ফুল। নানা রকম প্রসাধনীও ব্যবহার করত তারা।

মেয়েরা তো বটেই, ছেলেরাও সে যুগে অলংকার ব্যবহার করত। সোনার অলংকার পরতে পেত শুধু ধনী লোকেরা। তাদের বাড়ির ছেলেরাও সুবর্ণকুণ্ডল পরত, মেয়েরা কানে দিত সোনার 'তারঙ্গা'। হাতে, বাহুতে, গলায়, মাথায় সর্বত্রই সোনা-মণি-মুক্তা শোভা পেত তাদের মেয়েদের। সাধারণ পরিবারের মেয়েরা হাতে পরত শাঁখা, কানে কচি কলাপাতার মাকড়ি, গলায় ফুলের মালা।

ভাত বাঙালির বহুকালের প্রিয় খাদ্য। সরু সাদা চালের গরম ভাতের কদর সব চাইতে বেশি ছিল বলে মনে হয়। পুরোনো সাহিত্যে ভালো খাবারের নমুনা হিসেবে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা এই : কলার পাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, নালিতা শাক, মৌরলা মাছ আর খানিকটা দুধ। লাউ, বেগুন ইত্যাদি তরিতরকারি প্রচুর খেত সেকালের বাঙালিরা, কিন্তু ডাল তখনো বোধহয় খেতে শুরু করেনি। মাছ তো প্রিয় বস্তুই ছিল–বিশেষ করে ইলিশ মাছ। শুঁটকির চল সেকালেও ছিল–বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে। ছাগমাংস সবাই খেত–হরিণের মাংস বিয়ে বাড়িতে বা এ রকম উৎসবেই সাধারণত দেখা যেত। পাখির মাংসও তাই। ক্ষীর, দই, পায়েস, ছানা–এসব ছিল বাঙালির নিত্য প্রিয়। আম-কাঁঠাল, তাল-নারকেল ছিল প্রিয় ফল। আর খুব চল ছিল খাজা, মোয়া, নাড়ু, পিঠেপুলি, বাতাসা, কদমা এসবের। মশলা দেওয়া পান খেতেও সকলে ভালোবাসত।

সাধারণ লোকে মাটির পাত্রেই রান্নাবান্না করত। 'জালা', 'হাঁড়ি', 'তেলানি'–সচরাচর এসব পাত্রের ব্যবহারই করা হতো।

সেকালের পুরুষেরা ছিল শিকারপ্রিয়। কুস্তি খেলারও চল ছিল বেশ। মেয়েরা সাঁতার দিতে ও বাগান করতে ভালোবাসত। মেয়েরা খেলত কড়ির খেলা–ছেলেরা দাবা আর পাশা। ধনী লোকেরা ঘোড়া আর হাতির খেলা দেখত। যাদের সে ক্ষমতা ছিল না, তারা ভেড়ার লড়াই আর মোরগ-মুরগির লড়াই বাঁধিয়ে দিত। নাচগানের বেশ প্রসার ছিল। বীণা, বাঁশি, কাড়া, ছোটো ডমরু, ঢাক–এসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল।

যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল নৌকা। হাতির পিঠে ও ঘোড়া-গাড়িতে চড়ত শুধু অবস্থাপন্ন লোকেরা। গরুর গাড়ি সাধারণ লোকে ব্যবহার করত–তবে সব সময় নয়–বিশেষ উপলক্ষে। মেয়েরা 'ডুলি'তে চড়ত। পালকির ব্যবহারও ছিল। ধনী লোকদের পালকি হতো খুব সাজানো-গোছানো, রাজবাড়িতে হাতির দাঁতের পালকিও থাকত।

বেশির ভাগ লোকই থাকত কাঠ-খড়-মাটি-বাঁশের বাড়িতে। ধনী লোকেরাই শুধু ইট-কাঠের বাড়ি করত।

ওপরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বারবার বলতে হয়েছে সকলে এক রকম ছিল না। কেননা, সেই পুরনো কাল আর নেই, যখন সবাই মিলে মিশে কাজ করত। রাজা এসে গেছেন সমাজে। তাই কেউ প্রভু, কেউ ভৃত্য। কেউ প্রভুর প্রভু, কেউ দাসের দাস! দুজন প্রাচীন সংস্কৃত কবির রচনায় তাই এমন দুটি ছবি পাওয়া যায়–সে দুটো ছবি যে একই দেশের, সে কথা মনে হয় না। একজন দিয়েছেন মেয়েদের বর্ণনা: কপালে কাজলের টিপ, হাতে চাঁদের কিরণের মতো সাদা পদ্মবৃন্তের বালা ও তাগা, কানে কচি রিঠা ফলের দুল, স্নানস্নিগ্ধ কেশে তিলপল্লব।

আরেকজন এঁকেছেন সংসারের ছবি: নিরানন্দে তার দেহ শীর্ণ, পরনে ছেঁড়া কাপড়। ক্ষুধায় পেট আর চোখ বসে গেছে শিশুদের, যেন এক মণ চালে তার একশ দিন চলে যায়।

রাজাদের দল এখন আর নেই। মৌর্য-গুপ্ত, পাল-সেন, পাঠান-মুঘল, কোম্পানি-রানি এদের কাল শেষ হয়েছে। আজকের দুই কবিও হয়তো দুই প্রান্তে বসে এমনি করে কবিতা লিখছেন। একজন লিখছেন সমৃদ্ধির কথা, বিলাসের কথা, আনন্দের কথা। আরেকজন ছবি আঁকছেন নিদারুণ অভাবের, জ্বালাময় দারিদ্র্যের, অপরিসীম বেদনার। সরু চালের সাদা গরম ভাতে গাওয়া ঘি–কতকাল ধরে কত মানুষ শুধু তার স্বপ্নই দেখে আসছে।

শব্দের অর্থ

গর্দান যাওয়া: মাথা কাটা।

ঘোড়াচুড়: এক ধরনের খোঁপার নাম।

ডুলি: ছোটো পালকি।

তাগা: বাহুতে পরার অলংকার।

তারঙ্গা: কানে পরার অলংকার।

তিলপল্লব: তিলগাছের কচি পাতা।

নিরানন্দ: আনন্দহীন।

পদ্মবৃন্ত: পদ্ম ফুলের বোঁটা।

বদৌলতে: কারণে।

মাকড়ি: একপ্রকার দুল।

লোক-লস্কর: সশস্ত্র লোক ও তাদের সহযোগী।

শীর্ণ: রোগা।

সামন্ত: জমিদার।

সুবর্ণকুণ্ডল: সোনার দুল।

স্নানস্নিগ্ধ কেশ: ধোয়া চুল।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. এই রচনাটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা? .....

.....

খ. এই লেখা থেকে কয়েকটি বিশ্লেষণমূলক বাক্য খুঁজে বের করো। .....

.....

.....

.....

.....

গ. বিবরণমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী মিল-অমিল আছে? .....

.....

.....

.....

.....

ঘ. তথ্যমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী মিল-অমিল আছে? .....

.....

.....

.....

.....

ঙ. এই লেখার উপর তোমার মতামত দাও। .....

.....

.....

.....

.....

.....

বলি ও লিখি

‘কত কাল ধরে’ রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

লেখা নিয়ে মতামত

‘কত কাল ধরে’ রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো।

‘কত কাল ধরে’ রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১.	
২.	

তথ্য বিশ্লেষণ

‘কত কাল ধরে’ লেখাটির প্রায় পুরো অংশে লেখক এ অঞ্চলের প্রাচীন যুগের সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। নারী ও পুরুষ কোন ধরনের পোশাক ও অলংকার পরত, এখানকার মানুষ কোন ধরনের খাবার খেতো, তাদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয় কী ছিল, এগুলোর বিবরণ লেখক দিয়েছেন। এই বিবরণ দিতে গিয়ে লেখককে বিভিন্ন ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়েছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ

ছক বা সারণিতে যেসব সংখ্যা বা বিষয় থাকে, সেগুলোকে বলে উপাত্ত। উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য পাওয়া যায়। নিচের ছকে কিছু উপাত্ত আছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনীর ভয়াবহ অত্যাচারে বিপুল সংখ্যক মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছিল। আশ্রয় নেওয়া মানুষকে শরণার্থী বলে। তাদের জন্য বহু সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছিল। এই ছকে উপাত্ত হিসেবে আশ্রয়কেন্দ্র ও শরণার্থীর সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতের প্রদেশ	আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	শরণার্থীর সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	৪৯২	৭২,৩৫,৯১৬ জন
ত্রিপুরা	২৭৬	১৩,৮১,৬৪৯ জন
মেঘালয়	১৭	৬,৬৭,৯৮৬ জন
আসাম	২৮	৩,৪৭,৫৫৫ জন
বিহার	৮	৩৬,৭৩২ জন
মধ্যপ্রদেশ	৩	২,১৯,২৯৮ জন
উত্তর প্রদেশ	১	১০,১৬৯ জন
মোট	৮২৫	৯৮,৯৯,৩০৫ জন

উপরের উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণমূলক বাক্য রচনা করা যায়। যেমন, একটি বাক্য: পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শরণার্থী ক্যাম্প ছিল। আবার, আরেকটি বাক্য হতে পারে এমন: উত্তর প্রদেশে ১০ হাজারের কিছু বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল।

এভাবে এই ছকের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আরও কয়েকটি বাক্য রচনা করো।

১. .....

২. .....

৩. .....

৪. .....

৫. .....

৬. .....

৭. .....

৮. .....

৯. .....

১০. .....

উপরে লেখা বিশ্লেষণমূলক বাক্যগুলোর ভিত্তিতে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করো। লেখার শুরুতে একটি শিরোনাম দাও।

_____

.....

.....

.....

.....

৫ম পরিচ্ছেদ

কল্পনানির্ভর লেখা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় লেখক। তাঁর জন্ম ১৯৫২ সালে। তিনি কিশোর উপযোগী প্রচুর সংখ্যক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, যেমন: 'দীপু নাম্বার টু' 'আমার বন্ধু রাশেদ' ইত্যাদি। তাঁর লেখা বইয়ের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি; যেমন: 'কপোট্রনিক সুখ দুঃখ', 'ত্রিনিটি রাশিমালা', 'প্রজেক্ট নেবুলা' ইত্যাদি। নিচে তাঁর লেখা একটি গল্প দেওয়া হলো।

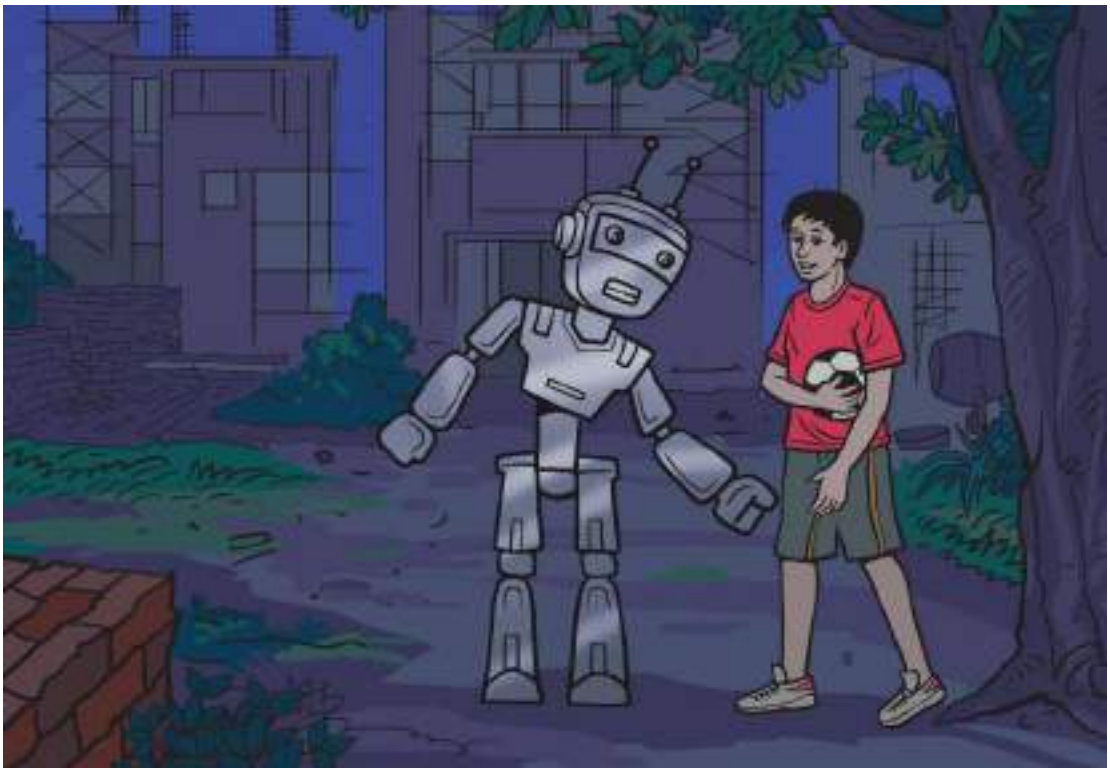

আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে সেই ছেলেবেলা থেকে। রঞ্জুর বয়স তখন চার, তার আব্বা-আম্মা ভাবলেন সে এখন বড়ো হয়ে গেছে, তার আলাদা ঘরে ঘুমানো উচিত। বড়ো বোন শিউলির ঘরে তার জন্যে ছোটো খাট দেওয়া হলো, সেখানে রইল রংচঙে চাদর আর ঝালর দেওয়া বালিশ। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে যেন একা একা না লাগে সেজন্যে মাথার কাছে রইল তার প্রিয় খেলনা ভালুক। গভীর রাতে আম্মা দেখেন রঞ্জু ঘুম থেকে উঠে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলে এসেছে। আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো? ঘুম থেকে উঠে এলি যে?

রঞ্জু তার আব্বা আর আম্মার মাঝখানে শুতে শুতে বলল, ভালুকটা ঘুমাতে দেয় না।

আম্মা চোখ কপালে তুলে বললেন, খেলনা ভালুক তোকে ঘুমাতে দেয় না?

না। যখনই ঘুমাতে যাই খামচি দেয়। রঞ্জু শার্টের হাতা গুটিয়ে দেখাল, এই দেখো।

আম্মা দেখলেন আঁচড়ের দাগ। বিকেলবেলা পাশের বাসার ছোটো মেয়েটির পুতুল কেড়ে নিতে গিয়ে খামচি খেয়েছিল, নিজের চোখে দেখেছেন। মাঝরাতে সেটা নিয়ে রঞ্জুর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন না।

পরদিন তার বিছানায় খেলনা ভালুকটা সরিয়ে সেখানে ছোটো একটা কোলবালিশ দেওয়া হলো। কিন্তু আবার মধ্যরাতে দেখা গেল রঞ্জু গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলে এসেছে। আম্মাকে ডেকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিজের জন্যে জায়গা করতে করতে বলল, খুব দুষ্টুমি করছে।

কে?

ময়ূরটা।

কোন ময়ূর?

ওই যে দেয়ালে।

আম্মার মনে পড়ল সেই ঘরের দেয়ালে শিউলি একটা ময়ূরের ছবির পোস্টার লাগিয়ে রেখেছে, বললেন, সেটা তো ছবি।

রঞ্জু মাথা নাড়ল, ছবি ছিল। রাত্রিবেলা ছবি থেকে বের হয়ে এসে পায়ে ঠোকর দেয়। এই দেখো আমার বুড়ো আঙুলে ঠোকর দিয়েছে।

অন্ধকারে আম্মা রঞ্জুর পায়ের নখ বা ময়ূরের কাজকর্ম দেখার উৎসাহ অনুভব করলেন না। রঞ্জুকে পাশে শোয়ার জায়গা করে দিলেন।

ব্যাপারটা এইভাবে শুরু হয়েছে–প্রয়োজনে রঞ্জু চমৎকার গল্প ফেঁদে বসে। আব্বা বললেন, ছোটো মানুষ সত্যি-মিথ্যে গুলিয়ে ফেলে। বড়ো হলে ঠিক হয়ে যাবে।

যত দিন যেতে থাকল রঞ্জুর বানিয়ে গল্প বলার অভ্যাস আরো বেড়ে যেতে থাকল। বছরখানেক পরে রঞ্জুকে নিয়ে সমস্যা আরো বেড়ে গেল–কারণ তখন হঠাৎ করে সে সায়েন্স ফিকশন পড়া আরম্ভ করেছে। সায়েন্স ফিকশনের উদ্ভট কাহিনি পড়ে তার মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গেল–আগে বানিয়ে বানিয়ে সে যেসব গল্প বলত সেগুলো তবুও কোনো না কোনোভাবে সহ্য করা যেত। কিন্তু আজকাল যেগুলো বলে সেগুলো আর সহ্য করার মতো নয়।

রঞ্জুর এই গল্প বলা রোগের সবচেয়ে ভুক্তভোগী হচ্ছে তার বড়ো বোন শিউলি। বড়ো বোনেরা সাধারণত নানাভাবে ছোটো ভাইদের উৎপাত করে থাকে, কিন্তু শিউলি মোটেও সেরকম মেয়ে না, সে ধৈর্য ধরে রঞ্জুর গল্প শুনত, গল্পের যেখানে বিস্ময় প্রকাশ করার কথা সেখানে বিস্ময় প্রকাশ করত, যেখানে দুঃখ পাওয়ার কথা সেখানে দুঃখ পেত, যেখানে খুশি হওয়ার কথা সেখানে খুশি হতো। গল্প শুনে সে কখনো বিরক্ত হতো না এবং যত আজগুবিই হোক না কেন সবসময় সে এমন ভান করত যেন সে গল্পটা বিশ্বাস করেছে।

রঞ্জুর সায়েন্স ফিকশনের প্রতি বাড়াবাড়ি প্রীতি জন্ম নেবার পর শিউলির জন্যেও গল্পগুলো হজম করা কঠিন হয়ে পড়তে শুরু করল। প্রায় প্রতিদিনই রঞ্জু এসে মহাকাশের কোনো এক আগন্তুকের কথা বলতে লাগল। কোনদিন সেই আগন্তুক তাকে ব্ল্যাকহোলের গোপন রহস্যের কথা বলে গেছে, তার কাছে কাগজ কলম ছিল না বলে লিখে রাখতে পারেনি, লিখে রাখতে পারলেই পৃথিবীতে হইচই শুরু হয়ে যেত। কোনদিন একটা ফ্লাইং সসার থেকে বিদঘুটে কোন প্রাণী লেজারগান দিয়ে তাকে গুলি করতে চেষ্টা করেছে আর সে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে, আবার কোনদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে একটা জারুল গাছের নিচে চতুষ্কোণ একটা উজ্জ্বল আলো দেখে সেখানে উঁকি মারতেই ভিন্ন একটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক ঝলক দৃশ্য দেখে এসেছে।

একদিন রঞ্জু এসে শিউলিকে খুব উত্তেজিত গলায় বলল, আপু, যা একটা কাণ্ড হয়েছে!

শিউলি চোখেমুখে যথেষ্ট আগ্রহ ফুটিয়ে বলল, কী হয়েছে?

ফুটবল খেলে ফিরে আসছি, দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে নূতন যে বিল্ডিংগুলো তৈরি হচ্ছে তার ভিতর দিয়ে শর্টকাট মারছি। মাঝামাঝি জায়গাটায় যেখানে ইটগুলো সাজিয়ে রেখেছে সেখানে আসতেই হঠাৎ একটা রোবট বের হয়ে এল।

শিউলি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, রোবট?

হ্যাঁ। চকচকে স্টেনলেসের শরীর। মাথার দুই পাশ থেকে আলো বের হচ্ছে, চোখগুলো সবুজ। আমাকে দেখে হাত তুলে নাকি স্বরে বলল, এ-ই-ছে-লে-কো-থা-য়-যা-ও?

শিউলি হাসি গোপন করে বলল, তাই নাকি? আমি জানতাম শুধু পেতনিরা নাকি স্বরে কথা বলে, রোবটরাও তাহলে নাকি স্বরে কথা বলে?

রঞ্জু মাথা নেড়ে বলল, তাই তো দেখলাম। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, বাসায় যাই।

রোবটটা বলল, তু-মি-কি-আ-মা-র-এ-ক-টা-উ-প-কা-র-ক-র-তে-পা-র-বে?

আমি বললাম, কী উপকার? তখন সেটা বলল তার নাকি ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমি তো অবাক! রোবটের আবার খিদে পায় নাকি? তখন রোবটটা আমাকে বলল তাদের যখন খিদে পায় তখন তাদের ব্যাটারি খেতে হয়। মোটা মোটা ডি সাইজের ব্যাটারি।

শিউলি বিস্ময়ের ভান করে বলল, তাই নাকি?

রঞ্জু মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

তুই ব্যাটারি কিনে দিলি?

হ্যাঁ–দোকান থেকে দুই ডজন ব্যাটারি কিনে দিয়ে এলাম, আর আমার সামনে কচ কচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল।

ব্যাটারি কেনার পয়সা পেলি কই?

রোবটটাই দিলো, তার কাছে সব দেশের টাকা আছে।

শিউলি হাসি গোপন করে বলল, তুই যে রোবটের এত বড়ো উপকার করলি, সে তোকে কিছু উপহার দিলো না?

রঞ্জু মনমরা হয়ে বলল, দিয়েছে।

কী দিয়েছে?

রঞ্জু পকেট থেকে কয়েকটা তেঁতুলের বিচি বের করে বলল, এইগুলো।

তেঁতুলের বিচি?

এগুলো দেখলে মনে হয় সাধারণ তেঁতুলের বিচি, আসলে এর থেকে যে গাছ বের হয় সেটা থেকে ক্যানসারের ওষুধ বের করা যাবে।

শিউলি গম্ভীর গলায় বলল, তাহলে এগুলো যত্ন করে রাখিস, আবার হারিয়ে না যায়।

হ্যাঁ, রাখব।

রঞ্জু তখন তেঁতুলের বিচি খুলে তার ছোটো বাক্সটার মাঝে গুছিয়ে রাখল।

এর কয়দিন পরের কথা। আম্মা নানাকে একটা চিঠি লিখছেন। পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ যখন বলপয়েন্ট কলম দিয়ে লিখছে তখন আম্মা কোন একটা বিচিত্র কারণে ফাউনটেন পেন ছাড়া লিখতে চান না। চিঠি লিখতে লিখতে হঠাৎ আম্মার ফাউনটেন পেনে কালি শেষ হয়ে গেল। আম্মা রঞ্জুকে ডেকে বললেন, কালির দোয়াতটা নিয়ে আয় তো।

রঞ্জু দোয়াতটা নিয়ে আসছিল আর ঠিক তখন কোনো কারণ নেই, কিছু নেই হঠাৎ করে সে হোঁচট খেল, সাথে সাথে হাত থেকে কালির দোয়াত ছিটকে গেল উপরে, তারপর আছড়ে পড়ল নিচে–আর কিছু বোঝার আগে দোয়াত ভেঙে একশ টুকরা হয়ে মেঝেতে কার্পেটে কালি ছড়িয়ে একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা হলো।

আম্মা তখন এমন রেগে গেলেন যে, সে আর বলার মতো নয়। রঞ্জুকে বকতে বকতে আম্মা তার বারোটা বাজিয়ে ছাড়লেন–এমন এমন কথা বলতে লাগলেন যে রঞ্জুর মনে হতে লাগল যে বেঁচে থাকার বুঝি কোনো অর্থই হয় না। খানিকক্ষণ সে ফ্যাসফ্যাস করে কাঁদল, তারপর সে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল।

নির্জন ছাদ, পাশে কয়েকটা নারকেল গাছ, বাতাসে তাদের পাতা ঝিরঝির করে নড়ছে। আকাশের মাঝামাঝি অর্ধেকটা চাঁদ, তাতেই চারদিকে আলো হয়ে আছে। ছাদে এসে রঞ্জুর মনটা একটু শান্ত হলো। এ রকম সময় রঞ্জুর মনে হলো পেছনে কেমন জানি এক ধরনের শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। একটু অবাক হয়ে পেছন ঘুরে সে যেটা দেখল তাতে তার সমস্ত শরীর শীতল হয়ে গেল, গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দেবে দেবে করেও সে অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে রাখল।

রঞ্জু দেখল তার পেছনে দুই মানুষ সমান উঁচু জায়গাতে গোলমতোন একটা মহাকাশযান ভাসছে। সেটি বিরাট বড়ো, প্রায় পুরো ছাদ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে–ঠিক নিচে একটা গোল গর্তের মতোন, সেখান থেকে নীল আলো বেরিয়ে আসছে। মহাকাশযানটি প্রায় নিঃশব্দ, শুধু হালকা একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ, খুব কান পেতে থাকলে শোনা যায়।

রঞ্জু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। প্রথমে মনে হলো সে বোধহয় পাগল হয়ে গেছে–পুরোটা একটা দৃষ্টিবিভ্রম, কিন্তু ভালো করে তাকাল সে, বুঝতে পারল এটা দৃষ্টিবিভ্রম নয়, সত্যি সত্যি দেখছে। কী করবে বুঝতে না পেরে সে মুখ হা করে তাকিয়ে রইল।

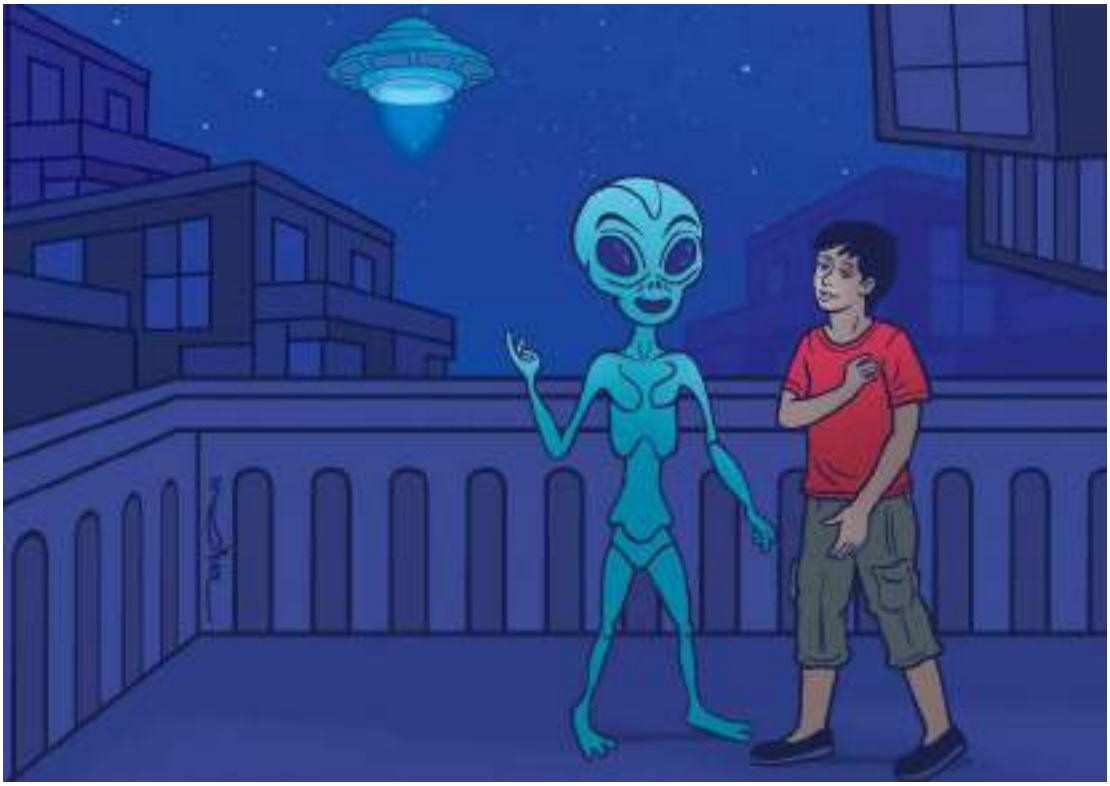

একটু পরে নীল আলোতে হঠাৎ একটা আবছা ছায়া দেখতে পায়, ছায়াটা কিলবিল করে নড়তে থাকে, তারপর হঠাৎ সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়, মনে হতে থাকে অনেক দিন না খেয়ে একটা মানুষ শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে–শুধু মাথাটা না শুকিয়ে আরো বড়ো হয়ে গেছে, সেখানে গোল গোল চোখ, নাক নেই, সেখানে দুটি গর্ত। মুখের জায়গায় গোল একটা ফুটো দেখে মনে হয় বুঝি খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

প্রাণীটি কিলবিল করতে করতে একটা শব্দ করল। শব্দটি অদ্ভুত। শুনে মনে হয় একজন মানুষ হাঁচি দিতে গিয়ে থেমে গিয়ে কেশে ফেলেছে। রঞ্জু কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, ওয়েলকাম জেন্টলম্যান।

কেন জানি তার ধারণা হলো ইংরেজিতে কথা বললে সেটা এই প্রাণী ভালো বুঝতে পারবে। প্রাণীটা তখন হঠাৎ করে পরিষ্কার বাংলায় বলল, শুভসন্ধ্যা মানবশিশু।

রঞ্জু অবাক হয়ে বলল, তুমি বাঙালি?

প্রাণীটা বলল, না, আমি বাঙালি নই। তবে আমি তোমার গ্রহের যে কোনো মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারি। এই দেখো– বলে প্রাণীটা পরিষ্কার চাটগাঁয়ের ভাষায় বলল, 'আঁসার বজা কুড়ার বজা ফত্যি আডত বেচি, বাজার গরি বাড়িত আইলে ইসাব লয় তোঁর চাচি'। ফ্লাইং সসার এবং তার রহস্যময় প্রাণী দেখে রঞ্জু যত অবাক হয়েছিল, তার মুখে চাটগাঁয়ের কথা শুনে সে তার থেকে বেশি অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সাথে সাথে আরো একটা ব্যাপার ঘটল, তার ভেতর থেকে ভয়টা পুরোপুরি দূর হয়ে গেল। সে খুক খুক করে একটু হেসে ফেলে বলল, তোমার নাম কী?

তোমাদের মতো আমাদের নামের প্রয়োজন হয় না। আমরা এমনিতেই পরিচয় রাখতে পারি।

রঞ্জু বলল, আমার নাম রঞ্জু। তোমাকে দেখে আমার খুব মজা লাগছে।

কেন?

আমার তো সায়েন্স ফিকশন পড়তে খুব ভালো লাগে–তাই।

প্রাণীটা কাশির মতো একটা শব্দ করে বলল, সায়েন্স ফিকশন হচ্ছে গাঁজাখুরি।

তু–তুমি সায়েন্স ফিকশন পড় না?

আমাদের কিছু পড়তে হয় না। আমরা এমনিতেই সব জানি।

সত্যি?

সত্যি। আমরা তোমার কাছে এসেছি একটা কারণে। আমাদের এক্ষুনি ক্র্যাব নেবুলাতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের ফুয়েল ট্যাংকে একটা লিক হয়েছে, সেটা সারানোর সময় নেই। তুমি সেজন্যে আমাদের সাহায্য করবে।

রঞ্জু অবাক হয়ে বলল, আমি?

হ্যাঁ তুমি।

কীভাবে?

তোমার বাম পকেটে একটা চুইংগাম আছে। সেটা চিবিয়ে নরম করে দাও, আমাদের ট্যাংকের লিকটাতে সেটা লাগিয়ে নেব।

রঞ্জু অবাক হয়ে গেল, সত্যি সত্যি তার পকেটে চুইংগামের একটা স্টিক আছে। সেটা মুখে পুরে চিবিয়ে নরম করে মুখ থেকে বের করে প্রাণীটার দিকে এগিয়ে দেয়। প্রাণীটা বলল, আরও কাছে আসো। আমি এই নীল শক্তি বলয় থেকে বের হতে পারব না।

রঞ্জু আরেকটু এগিয়ে গেল। প্রাণীটা তখন তার তুলতুলে নরম হাত দিয়ে চুইংগামটা নিয়ে বলল, অনেক ধন্যবাদ।

রঞ্জু বলল, এখন তোমরা যাবে?

হ্যাঁ। তুমি আমাদের সাহায্য করেছ বলে আমরা তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই।

রঞ্জু কাঁপা গলায় বলল, কী উপহার?

আমরা যেখানে থাকি, সেই ক্র্যাব নেবুলার একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি আছে। তোমাদের গ্রহতেই পেয়েছি, আমরা অনেকগুলো নিয়ে যাচ্ছি আমাদের বাসস্থানে। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি একটা। হাত বাড়াও–

উত্তেজনায় রঞ্জুর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হলো। সে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং সেখানে গোলমতোন একটা জিনিস এসে পড়ল।

প্রায় সাথে সাথেই নীল আলোটা ভেতরে ঢুকে যায় আর ফ্লাইং সসারের মতো জিনিসটা ঘুরপাক খেতে খেতে উপরে উঠে যেতে থাকে। রঞ্জু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল সেটা ছোটো হয়ে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

গোলাকার জিনিসটা হাতে নিয়ে সে সিঁড়ির দিকে ছুটে যায়। সিঁড়ির আলোতে জিনিসটা ভালো করে দেখল এবং সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল সেটা একটা আমড়া। সাথে সাথে তার মনে পড়ল আমড়ার আঁটিটা আসলে সত্যিই ক্র্যাব নেবুলার মতো দেখতে। মহাকাশের এক বিচিত্র প্রাণী তার সাথে এ রকম ফাজলামি করবে কে জানত!

রঞ্জু হতচকিতের মতো নিজের ঘরে এসে ঢুকল, শিউলি তাকে দেখে এগিয়ে আসে, কী রে রঞ্জু তুই কোথায় ছিলি, খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

রঞ্জু নিচু গলায় বলল, ছাদে।

ছাদে একা একা কী করছিলি?

রঞ্জু খানিকক্ষণ শিউলির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, কিছু না।

কিছু না?

না।

শিউলি একটু অবাক হয়ে রঞ্জুর দিকে ঘুরে তাকাল, তাকে ভালো করে দেখল, তারপর জিজ্ঞেস করল, তোর কী হয়েছে? এ রকম করে তাকিয়ে আছিস কেন?

কী রকম করে?

মনে হচ্ছে তুই ভূতটুত কিছু একটা দেখে এসেছিস!

রঞ্জু কিছু বলল না। শিউলি আবার জিজ্ঞেস করল, তোর হাতে ওটা কী?

আমড়া।

আমড়া! শিউলির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমার জন্যে এনেছিস?

রঞ্জু দুর্বলভাবে হেসে বলল, তুমি নেবে?

দে– শিউলি রঞ্জুর হাত থেকে আমড়া নিয়ে ওড়না দিয়ে মুছে একটা কামড় দিয়ে বলল, উহ্! কী টক! কোথায় পেলি এই আমড়া?

রঞ্জু কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কোথায় আবার পাব? সবাই যেখানে পায় সেখানেই পেয়েছি!

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

আগন্তুক: হঠাৎ চলে আসা ব্যক্তি।

উদ্ভট: আজগুবি।

ওয়েলকাম জেন্টেলম্যান: ভদ্রমহোদয়গণ, স্বাগত জানাই।

কচ কচ: কোনো কিছু চিবানোর শব্দ।

কার্পেট: মেঝেতে পাতা হয় এমন পুরু চাদর।

কিলবিল করে নড়া: স্থির না থেকে আঁকাবাঁকা হয়ে নড়া।

ক্যানসার: একটি রোগের নাম।

ক্র্যাব নেবুলা: মহাকাশের একটি নীহারিকা।

খুক খুক করে হাসা: মৃদু শব্দে হাসা।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা: জোরে চিৎকার করা।

গাঁজাখুরি: অবিশ্বাস্য।

গুটি গুটি পায়ে: ধীরে ধীরে পা ফেলে।

চুইংগামের স্টিক: চুইংগামের পাতলা টুকরা।

ঝালর: নকশা-করা বাড়তি অংশ।

ঝিরঝির: মৃদু আওয়াজ।

ডি সাইজের ব্যাটারি: বড়ো আকারের ব্যাটারি।

ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে এমন ছবি।

দৃষ্টি বিভ্রম: চোখের ভুল।

দোয়াত: কালির পাত্র।

নাকিস্বর: নাক দিয়ে উচ্চারিত শব্দ।

নির্জন: জনশূন্য।

ফাউনটেন পেন: যে কলমে তরল কালি ব্যবহার করা হয়।

ফুয়েল ট্যাংক: যে পাত্রে জ্বালানি তেল থাকে।

ফ্যাসফ্যাস করে কাঁদা: চাপা গলায় কাঁদা।

বলপয়েন্ট কলম: যে কলমের মাথায় সূক্ষ্ম বল থাকে।

বারোটা বাজানো: অবস্থা খুব খারাপ করে দেওয়া।

বিতিকিচ্ছি অবস্থা: খারাপ অবস্থা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড: মহাবিশ্ব।

ব্ল্যাক হোল: কৃষ্ণ গহ্বর; মহাশূন্যে নক্ষত্রের একটি অন্তিম অবস্থা।

ভান করা: ভাব ধরা।

ভুক্তভোগী: ভুগেছে এমন।

মনমরা হওয়া: মন খারাপ করা।

মহাকাশযান: মহাকাশে চলাচলের উপযোগী যান।

মাথা বিগড়ে যাওয়া: চিন্তা এলোমেলো হওয়া।

লেজার গান: যে বন্দুক থেকে গুলির বিকল্প হিসেবে এক ধরনের আলোকরশ্মি বের হয়।

শক্তি বলয়: নিয়ন্ত্রণে থাকা বৃত্তাকার অঞ্চল।

শরীর শীতল হওয়া: ভয় পেয়ে যাওয়া।

শর্টকাট মারা: সংক্ষেপে কাজ সারা।

শোঁ শোঁ: দ্রুত ছুটে চলার শব্দ।

সায়েন্স ফিকশন: বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি।

স্টেনলেস: মরিচা পড়ে না এমন চকচকে লোহা।

হজম করা: গ্রহণ করতে পারা।

হতচকিত: হতভম্ব।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. ‘বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি’ বলতে কী বোঝ? .....

.....

.....

খ. আগে আর কোন ধরনের কল্পকাহিনি তুমি পড়েছ? .....

.....

.....

গ. ‘আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা’ গল্পের কোন কোন ঘটনা কাল্পনিক? .....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ. এই গল্পের কোন কোন ঘটনা বাস্তব? .....

.....

.....

.....

.....

ঙ. রূপকথার সাথে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মিল-অমিল কোথায়? .....

.....

.....

.....

.....

বলি ও লিখি

‘আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা’ গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

লেখা নিয়ে মতামত

‘আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা’ রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো।

‘আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা’ রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১.	
২.	
৩.	
৪.	

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি

চারপাশের যে জগৎ আমরা দেখতে পাই, তাকে বলে বাস্তব জগৎ। অনেক গল্পে বাস্তব জীবনের ঘটনার বর্ণনা থাকে। আবার এমন কিছু গল্প আছে যেগুলো বাস্তবের ঘটনার সাথে মেলে না। এগুলোকে কাল্পনিক গল্প বা কল্পকাহিনি বলে। তার মানে, বাস্তব জগতে বাস করেও গল্পকাররা কল্পনার জগৎ তৈরি করতে পারেন। বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখা এমন কাল্পনিক গল্পকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলে। এসব কাহিনিতে থাকে মহাকাশের কাল্পনিক প্রাণী, তাদের যাতায়াতের জন্য ফ্লাইং সসার, মানুষের মতো আচরণকারী রোবট ইত্যাদি। তাছাড়া এমন কিছু বিষয় থাকে যা বিজ্ঞান হয়তো এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি, কিন্তু লেখকরা সেই বিষয়কেও গল্পে নিয়ে আসেন।

রূপকথাও এক ধরনের কল্পনানির্ভর লেখা। তবে এর সাথে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মিল যেমন আছে, তেমনি অমিলও আছে। রূপকথার ঘটনা ও চরিত্র অতীতের–আধুনিক প্রযুক্তি আসার আগেকার। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির বিষয় ও চরিত্র সময়ের বিচারে আধুনিক–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রসরতায় এর জন্ম। রূপকথায় যে রাজপুত্র-রাজকন্যা বা দৈত্য-ডাইনি তুমি দেখতে পাও, বাস্তবের পৃথিবীতে তাদের দেখা যায় না। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতে মহাকাশের কাল্পনিক প্রাণী কিংবা রোবট নিয়ে যেসব গল্প তৈরি হয়েছে, তার কিছু কিছু ভবিষ্যতে সত্যি হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কল্পনানির্ভর রচনা লিখি

এবার তুমি একটি কল্পনানির্ভর গল্প লেখো। লেখাটি তুমি বানিয়ে লিখতে পারো, কিংবা সেটি তোমার আগে থেকে পড়া বা কারো কাছ থেকে শোনা গল্পও হতে পারে। লেখার শুরুতে একটি শিরোনাম দাও।

_____

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....